অধ্যায় ১১

ভূমিকম্প ও বাংলাদেশ

অধ্যায় ১১ ভূমিকম্প ও বাংলাদেশ

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিখতে পারবে—

- ☑ টেকটোনিক প্লেটের সঙ্গে ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির মতো ঘটনার সম্পর্ক
- ☑ বাংলাদেশ ও আশপাশের অঞ্চলে টেকটোনিক প্লেটগুলোর সময়ের সঙ্গে বিবর্তন
- ☑ ভূমিকম্পের পরিমাপ
- ☑ ভূমিকম্পে নিরাপত্তা

তোমরা হয়তো অনেকেই আচমকা পায়ের নিচের মাটি অথবা ঘরবাড়ি কেঁপে ওঠার সময় চমকে উঠেছ। অনেক ক্ষেত্রে এ রকম কাঁপুনি মনে এত ভয় ঢুকিয়ে দেয় যে, মনে হয় আবার কখন যেন মাটি কেঁপে উঠবে। মাটি বা ভূমি কেঁপে ওঠার এই ঘটনাকে আমরা ভূমিকম্প বা Earthquake বলি। যেহেতু মাটি কাঁপছে, সেহেতু মনে হওয়া স্বাভাবিক যে মাটির নিচে এমন কিছু আছে অথবা কিছু একটা ঘটনা ঘটছে যা উপরের গাছপালা, ঘরবাড়িসহ বিশাল এলাকার মাটিকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। আবার বাংলাদেশে না থাকলেও পৃথিবীর এমন কিছু এলাকা আছে যেখানে মাটি ও পাথরের ভিতর থেকে গলিত পাথর বা ম্যাগমা (Magma) বের হয়ে আসে (ম্যাগমা ভূত্বকের বাইরে বের হয়ে আসলে তাকে লাভা বলে)। কখনো তা ঘটে শান্তভাবে আবার কখনো ব্যাপক বিস্ফোরণের মাধ্যমে। একে আমরা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বলে থাকি। এসব ঘটনা কীভাবে ঘটে তা জানতে হলে আগে আমাদের জানতে হবে কেন এবং কীভাবে ভূমিকম্প ঘটে।

টেকটোনিক প্লেটের সঙ্গে ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির মতো ঘটনার সম্পর্ক

বাংলাদেশে খুব ঘন ঘন ভূমিকম্প না হলেও পৃথিবীর অনেক স্থানে ভূমিকম্প খুব সাধারণ ঘটনা, যেমন জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম অঞ্চল। বর্তমানে বাংলাদেশ এবং ভারতে কোনো আগ্নেয়গিরি নেই। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে এমনকি মহাসাগরের তলদেশে কয়েক কিলোমিটার পানির নিচেও আগ্নেয়গিরি আছে এবং তা থেকে অগ্ন্যুপাতও হচ্ছে। ভূতত্ত্ববিদেরা গবেষণা করে দেখেছেন, ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির সঙ্গে টেকটোনিক প্লেটের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যেসব স্থানে দুটি প্লেট আলাদা হয়েছে (প্লেট সীমানা), দেখা গেছে ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরি সেসব স্থানেই সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর মানচিত্রে ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরি একটি করে ডট (.) দিয়ে নির্দেশ করলে দেখা যাবে যে তা বিভিন্ন প্লেটের মধ্যে অবস্থিত সীমানার সঙ্গে মিলে যায়।

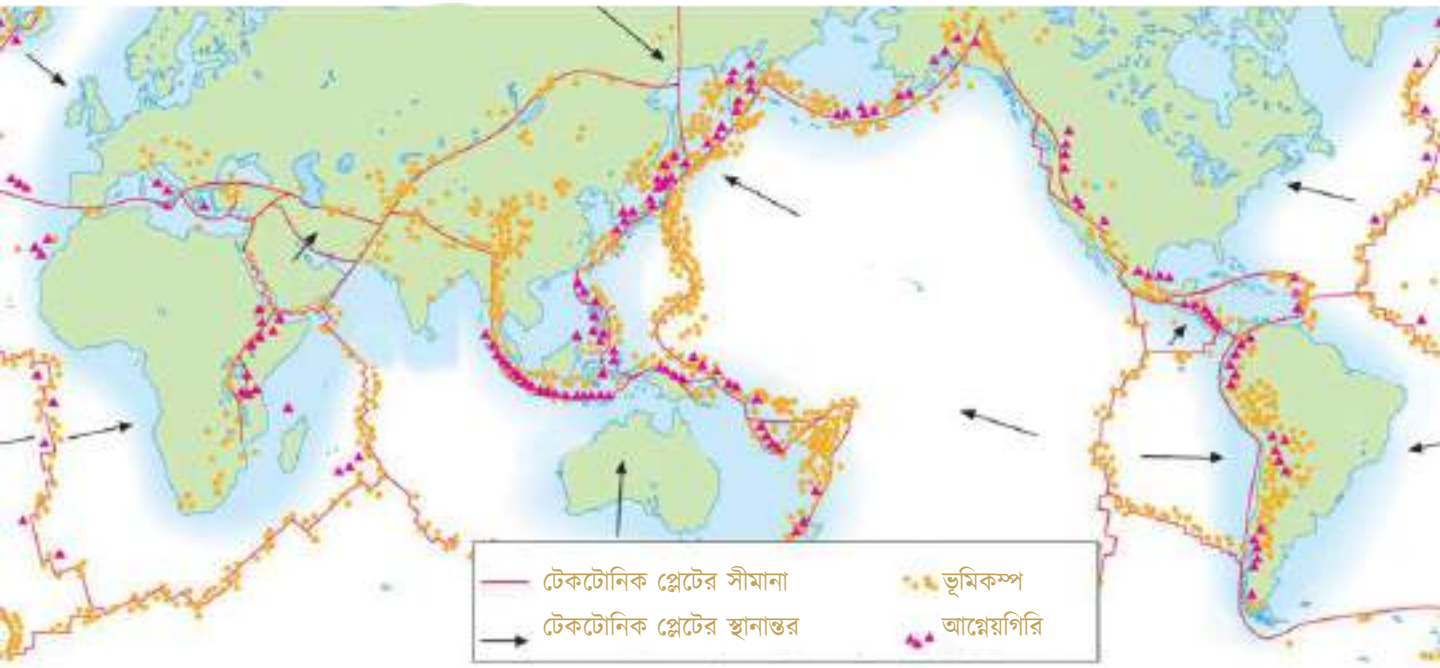

টেকটোনিক প্লেটের সীমানা কালো রেখা, ভূমিকম্পের স্থান লাল ডট এবং আগ্নেয়গিরির স্থান নীল ডট দিয়ে দেখানো হয়েছে।

যেহেতু প্লেটের গতি অতি অল্প তাই দীর্ঘ সময় ধরে দুটি প্লেটের সীমানাতে প্রচুর শক্তি সঞ্চিত হয়। যখন প্লেটের সীমানা আর সেই শক্তি ধরে রাখতে পারে না, তখন তা ভূমিকম্প সৃষ্টি করে নিঃসৃত হয়। এটি বেশি হয় যখন একটি প্লেটে অপর একটি প্লেটে ঘেঁষে গতিশীল থাকে বা সরতে থাকে। আবার যখন একটি প্লেট অপর একটি প্লেটের সঙ্গে সংঘর্ষ করে অথবা একটি অপরটি থেকে দূরে সরতে থাকে, তখন সেই সকল প্লেট সীমানাতে ভূমিকম্প ছাড়াও আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি হয়। আইসল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, ইতালি, জাপান, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে আগ্নেয়গিরি রয়েছে। এমনকি প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশেও অনেকগুলো আগ্নেয়গিরি রয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরের সবচেয়ে বড় টেকটোনিক প্লেট প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেটের উপর অবস্থিত। এই প্লেটের চারপাশের সীমানা বরাবর অনেকগুলো আগ্নেয়গিরি রয়েছে যা একত্রে মানচিত্রে দেখতে পুঁতির মালার মতো মনে হয়। আগ্নেয়গিরিপ্রবণ এই এলাকাকে তাই বলা হয় "প্রশান্ত অগ্নিমালা" (Pacific ring of fire)।

বাংলাদেশ ও আশপাশের অঞ্চলে টেকটোনিক প্লেটগুলোর সময়ের সঙ্গে বিবর্তন

বাংলাদেশে কোনো আগ্নেয়গিরি না থাকলেও বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমিকম্প হয়ে থেকে। বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক গঠন, টেকটোনিক প্লেটের অবস্থান এবং ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে। ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পূর্ব অংশ এবং বঙ্গোপসাগরের উত্তরে বাংলাদেশের অবস্থান। টেকটোনিক গঠনগত দিক দিয়ে ইন্ডিয়ান প্লেট, ইউরেশিয়ান প্লেট এবং বার্মিজ মাইক্রো প্লেটের সংযোগস্থল বাংলাদেশ এবং তার

কাছাকাছি এলাকায় পড়েছে। এ জন্য বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট, ময়মনসিংহ এমনকি ঢাকা শহরেও বছরে এক বা একাধিক ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটে।

প্লেট সীমানাতে অনেকগুলো চ্যুতিরেখা বা Fault Line থাকে। এসব চ্যুতিরেখা বরাবর যে ভূমিকম্প হয় তা নির্ভর করে মূলত প্লেটের গতি এবং সর্বশেষ কত সময় আগে ভূমিকম্প হয়েছে তার উপর। কারণ দীর্ঘ সময় ধরে প্লেট সীমানায় অবস্থিত চ্যুতিরেখায় শক্তি সঞ্চিত হতে থাকে। বাংলাদেশের ভেতর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় যেসব চ্যুতিরেখা সক্রিয় রয়েছে, সেগুলো যেকোনো সময় মাঝারি থেকে শক্তিশালী মাত্রার ভূমিকম্প সৃষ্টি করতে পারে। এই চ্যুতিরেখাগুলো হচ্ছে, ডাউকি চ্যুতি রেখা, শিলং মালভূমি, মধুপুর চ্যুতি, আসাম-সিলেট চ্যুতি এবং চট্টগ্রাম-মিয়ানমার প্লেট সীমানার চ্যুতি।

ভূমিকম্পের পরিমাপ

সিসমোগ্রাফ

আমাদের দেশের ভূমিকম্প নিয়ে সাধারণ মানুষের একটি ভুল ধারণা আছে। যখন ভূমিকম্প হয়, তখন বেশির ভাগ মানুষের ধারণা হয় সেটি বুঝি ঠিক তার পায়ের নিচে ঘটছে। প্রকৃতপক্ষে বেশির ভাগ সময় সেটি কয়েকশত কিলোমিটার কিংবা আরো দূরে কোথাও ঘটে এবং দূর থেকে তার কম্পনটি আমরা অনুভব করি। তোমরা যারা তোমাদের জীবনে কখনো ভূমিকম্প অনুভব করেছ, তারা সবাই লক্ষ করেছ, তখন মনে হয় পায়ের নিচের মাটি নড়ছে বা কাঁপছে। আসলেই তখন মাটি কাঁপতে থাকে এবং ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে কতদূরে মাটি কতটুকু কতটুকু কাঁপে তার পরিমাণ থেকে ভূমিকম্পের মাত্রাটির পরিমাপ করা হয়। এই সহজ এবং প্রচলিত পদ্ধতির নাম রিখটার স্কেল। আমরা যদি ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে ১০০ কিলিমিটার দূরে থাকি এবং সেখানে বসে ভূমিকম্প চলাকালীন আনুমানিক ১০০ মিমি (বা ১০ সেন্টিমিটার) বিস্তৃত কম্পন অনুভব করি, তাহলে সেটাকে ৫ মাত্রার ভূমিকম্প বলা হয়। যে যন্ত্র দিয়ে দিয়ে এই ধরনের ভূ-কম্পন মাপা হয় সেটিকে সিসমোগ্রাফ বলে।

রিখটার স্কেলে ৫ মাত্রার ভূমিকম্পহচ্ছে মাঝারি (Moderate) ভূমিকম্প। এর থেকে কম মাত্রার ভূমিকম্প হলে সেভাবে অনুভব করা যায় না। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্প ১ মাত্রা বেড়ে গেলে কম্পন ১০ গুণ বেড়ে যায়! কাজেই ৬ মাত্রার ভূমিকম্পের কম্পন ৫ মাত্রার কম্পন থেকে ১০ গুণ বেশি এবং সেটি বড় (Strong) ভূমিকম্প। আবার ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে ৬ মাত্রার ভূমিকম্পের চাইতেও ১০ গুণ বেশি কম্পন হয় কাজেই সেটি গুরুতর (Major) ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের প্রস্তুতি নেওয়া না থাকার কারণে ২০১০ সালে ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে হাইতিতে তিন লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল। ৮ মাত্রার ভূমিকম্প ৭ মাত্রা থেকে ১০ গুণ বেশি কম্পন হয়, কাজেই সেটাকে বিশাল অথবা ভয়াবহ (Great) ভূমিকম্প বলা যায়। পৃথিবীতে ৮ মাত্রার ভূমিকম্পের উদাহরণ খুব বেশি নেই। ৮ মাত্রার ভূমিকম্পে পুরো জনসম্পদ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার অনেক উদাহরণ যেরকম আছে, আবার ভূমিকম্পের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে রাখার কারণে ২০১৪ সালে চিলিতে মাত্র ছয়জন লোক মারা গিয়েছিল, সেই উদাহরণও আছে।

ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল থেকে আমরা যত দূরে থাকবো আমরা তত কম কম্পন অনুভব করব। উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায় ৫ মাত্রার একটা ভূমিকম্প ১০০ কিলোমিটার থেকে যতটুকু কম্পন পাওয়া যায়, ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের বেলায় ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে ৬০০ কিলোমিটার দূরে থেকে সেই একই পরিমাণ কম্পন অনুভব করা যাবে।

ভূমিকম্পের সময় বিস্তৃত এলাকায় টেকটনিক সীমানা থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তি বের হয়ে আসে। হিরোশিমাতে যে নিউক্লিয়ার বোমাটি ফেলা হয়েছিল একটি ৬ মাত্রার ভূমিকম্পে সেই পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়। তোমরা জেনেছ, রিখটার স্কেলে প্রতি মাত্রায় কম্পন ১০ গুণ করে বেড়ে যায়, কিন্তু নির্গত শক্তির পরিমাণ প্রতি মাত্রায় বেড়ে যায় প্রায় ৩২ গুণ! অর্থাৎ ৬ মাত্রার একটি ভূমিকম্পে যে পরিমাণ শক্তি বের হয় ৮ মাত্রার ভূমিকম্পে নির্গত শক্তি তার থেকে ১০০০ গুণ বেশি! কাজেই ৮ মাত্রার ভূমিকম্পে ১০০০টি হিরোশিমায় ব্যবহৃত নিউক্লিয়ার বোমার সমান শক্তি বের হয়।

ভূমিকম্পে নিরাপত্তা

ভূমিকম্প এমন একটি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কোনো একটি দেশ বা অঞ্চল পুরোপুরি ধ্বংস করে দিতে পারে। এমনকি বড় ভূমিকম্প নদীর গতিপথও পরিবর্তন করতে পারে। ১৭৬২ সালে এক ভয়াবহ ভূমিকম্পের ফলে আমাদের অন্যতম প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ বদলে গিয়েছিল। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত বড় ধরনের ভূমিকম্প না হলেও বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশ বড় ধরনের ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

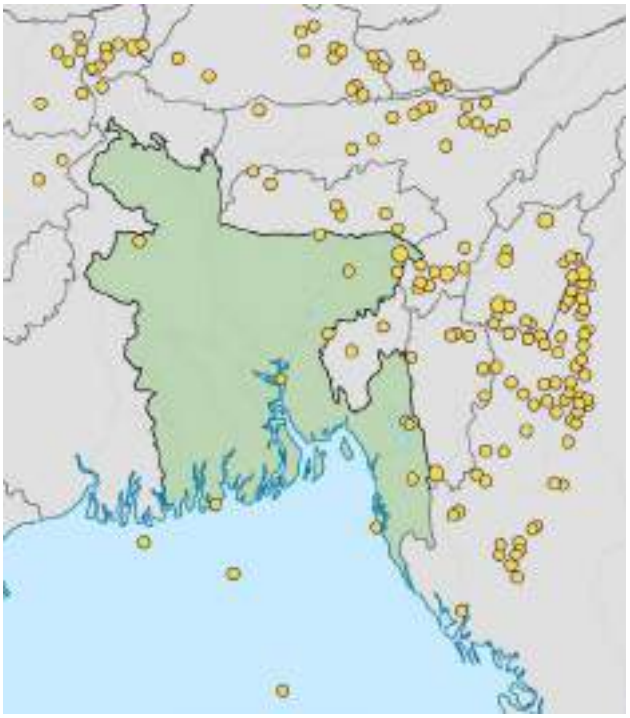

পাশের ছবিতে বাংলাদেশ এবং তার আশপাশের ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পগুলো দেখানো হয়েছে। ছবিতে নিশ্চয়ই দেখছ, বাংলাদেশের ভেতরে সাম্প্রতিককালে কোনো বড় ভূমিকম্প হয়নি, শুধু আশপাশের দেশে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পন অনুভূত হয়েছে। যেহেতু অতীতে এই অঞ্চলে বড় ভূমিকম্প হয়েছে, তাই আমাদের ধরে নিতে হয় ভবিষ্যতেও হতে পারে। সেটি কখন হবে যেহেতু আমাদের জানা নেই, তাই সব সময়েই প্রস্তুত থাকতে হবে।

বন্যা বা ঘূর্ণিঝড়ের মতো ভূমিকম্পের জন্য আগে থেকে কোনো সতর্ক বার্তা পাওয়া সম্ভব নয়। এটি যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময়ে আঘাত হানতে পারে, তাই ভূমিকম্পের জন্য সব সময় সতর্ক থাকতে হয়। ভূমিকম্পের বেলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিয়ম মেনে ঘর-বাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনা তৈরি করা। আমাদের দেশে যে সকল বড় বড় দালান-কোঠা তৈরি করা হয়, সেখানে অবশ্যই

ভূমিকম্প প্রতিরোধক নীতিমালা মেনে তৈরি করতে হবে। তা না হলে বড় ধরনের ভূমিকম্প হলে তা ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনতে পারে। সাধারণভাবে ভূমিকম্পের নিরাপত্তার জন্য নিচের বিষয়গুলো মেনে চলা যেতে পারে।

ভূমিকম্পের আগে

১. বাসায় আগুন নেভানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
২. প্রাথমিক চিকিৎসা কিট, শুকনা খাবার এবং পানি রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
৩. বাসায় গ্যাস, ইলেকট্রিসিটি এবং পানির সরবরাহ কীভাবে বন্ধ করতে হয় সেটি জেনে রাখতে হবে।

ভূমিকম্পের সময়

১. আমাদের দেশে প্রায় সব সময়েই আমরা শত শত কিলোমিটার দূরের কোনো ভূমিকম্পের রেশ অনুভব করে থাকি। কাজেই কোনো অবস্থাতেই অহেতুক ভয়ে এবং আতঙ্কে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হওয়া যাবে না। মাথা ঠান্ডা রাখলে বড় ভূমিকম্পের বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব।

শক্ত টেবিলের নীচে আশ্রয় নাও।

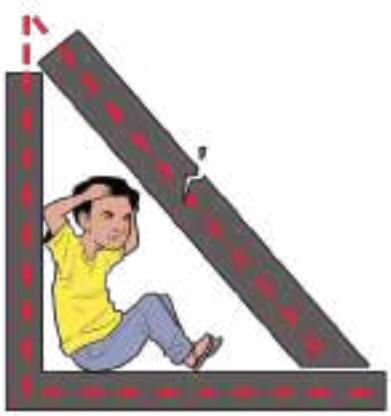

অথবা ঘরের কোণায় চলে যাতে কিছু ভেঙ্গে পড়লে সরাসরি গায়ের ওপরে না পড়ে একটা ত্রিভূজাকৃতির জায়গা থেকে যায় তোমার ওপর।

বাইরে থাকলে আতংকিত না হয়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে।

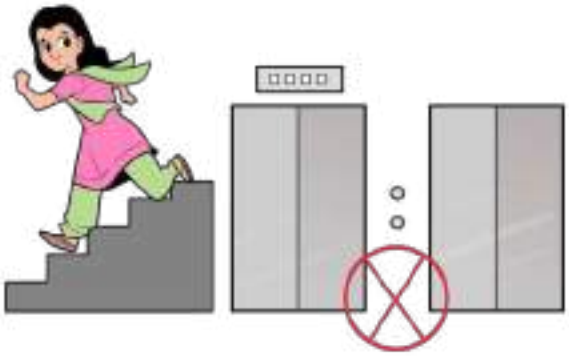

বিল্ডিং থেকে একান্ত নামতে চাইলে সিঁড়ি দিয়ে নামাই নিরাপদ।

২. যদি ভূমিকম্পটি একটি বড় ভূমিকম্প হয়, তুমি যদি ঘরের ভেতরে থাকো, তাহলে ভিতরেই থাকো, বাইরে যাওয়ার চেষ্টা কোরো না। কখনোই লিফট দিয়ে নামার চেষ্টা কোরো না। কাচের জানালা থেকে দূরে থাকো এবং দেয়ালের পাশে দাড়াও। প্রয়োজনে শক্ত টেবিলের নিচে আশ্রয় নাও।
৩. তুমি যদি ঘরের বাইরে থাকো, তাহলে বাইরেই থাকো, ঘরের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা কোরো না। ইলেকট্রিক পোল কিংবা বড় বিল্ডিং থেকে দূরে সরে যাও, উপর থেকে মাথার উপর কিছু পড়তে পারে।
৪. কোনোভাবেই ম্যাচ জ্বালিও না, গ্যাস পাইপ ভেঙে বাতাসে গ্যাসের মিশ্রণ আগুনের জন্যে খুবই বিপজ্জনক।

ভূমিকম্পের পরে

১. বড় ভূমিকম্প হয়ে থাকলে এবং কেউ আহত হলে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দাও। গুরুতর আহত হলে হাসপাতালে নাও, তবে মনে রেখো সত্যিকারের বড় ভূমিকম্প হলে হাসাপাতালে অসংখ্য মানুষকে জরুরি চিকিৎসা দিতে হয়। কাজেই হাসপাতালে যার প্রয়োজন বেশি তাকে আগে চিকিৎসা দেয়া হবে।
২. পানি, ইলেকট্রিসিটি, গ্যাস লাইন পরীক্ষা করো, যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে সরবরাহ বন্ধ করে দাও। বাসায় গ্যাসের গন্ধ পেলে ঘরের দরজা-জানালা খুলে ঘরের বাইরে যাও।
৩. রেডিওতে খবর শোনার চেষ্টা করো। টেলিফোন খুব কম ব্যবহার করবে। জরুরি কাজের জন্য ত্রাণ বাহিনীকে টেলিফোন নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে দাও।
৪. ক্ষতিগ্রস্ত বিল্ডিংয়ের বাইরে থেকো। ভাঙা কাচ ইত্যাদিতে যেন পা কেটে না যায়, সে জন্য খালি পায়ে হাঁটাহাঁটি করবে না।
৬. ধ্বংসপ্রাপ্ত বিল্ডিংয়ের নিচে আটকা পড়লে উদ্ধারকারী দল এলে তাদের সংকেত দেয়ার জন্য কোনো কিছুতে নিয়মিতভাবে আঘাত দিয়ে শব্দ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করো।
৭. বড় ভূমিকম্প হলে পরে, আফটার শক হিসেবে আরো ভূমিকম্প হতে পারে, সে জন্যে প্রস্তুত থেকো।

অনুশীলনী ?

১। ভূমিকম্প চলাকালীন সময় তুমি একটি উঁচু বিল্ডিংয়ের নিচে থাকলে নাকি উঁচুতে থাকলে বেশি কম্পন অনুভব করবে?